হিতেশরঞ্জন সান্যাল

ব্রিটিশপূর্ব ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের দেশে ইংরাজদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবার আগে চার ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রথমটি পাঠশালার শিক্ষা, দ্বিতীয়টি ফার্সী শিক্ষা, তৃতীয় মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা, চতুর্থ আখড়া চতুষ্পাঠীর শিক্ষা। ফার্সী শেখা হ'ত প্রধানতঃ ব্যবহারিক কারণে, দিল্লী-আগ্রায় বা নবাব সরকারে বা জমিদার সরকারে চাকরী পাবার উদ্দেশ্যে। সম্পন্ন ঘরে মুন্সী রেখে ছেলেদের ফার্সী শেখানো হ'ত। অনেক ক্ষেত্রে ফার্সী বিশারদরা বাড়িতে ছাত্র রেখে লেখাপড়া শেখাতেন। ফার্সী শিখতেন প্রধানতঃ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ বাড়ির ছেলেরা। সদ্গোপ প্রভৃতি নবশাখও কিছু কিছু ছিল। মক্তবে আরবী ফার্সী ও ইসলামী শাস্ত্রাদি কিছু পড়ানো হ'ত। উচ্চ শিক্ষার জন্য মক্তবের ছাত্ররা যেত মাদ্রাসায়। এখানে তারা ইসলামী শাস্ত্র, আচরণবিধি ও আইন বিষয়ে শিক্ষালাভ করত। স্বভাবতই এতে মুসলমান ভিন্ন আর কেউ পড়তে যেত না। মাদ্রাসায় সাধারণত উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরাই পড়তে যেত।

আখড়া চতুষ্পাঠীতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের পড়বার অধিকার ছিল। চতুষ্পাঠী বা টোলে কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, ন্যায় ও স্মৃতি পড়ান হত। আয়ুর্বেদ পড়াবার জন্য স্বতন্ত্র টোল থাকত। যে ছেলে টোলে পড়বে ঠিক হ'ত সে পাঠশালায় যেত না। তার বিদ্যারম্ভ হ'ত বাড়িতেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে পাঠান হ'ত আখড়ায়। এখানকার পাঠক্রম প্রধানতঃ ব্যাকরণ ও কিছুটা কাব্য ও অলঙ্কার। আখড়ার শিক্ষা শেষ করে তারপর টোলে গিয়ে পড়াশোনা।[১]

আখড়া চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা ও ফার্সী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বিশারদ তৈরী করা। সাধারণতঃ উচ্চবংশীয় ছাত্ররা, হিন্দুদের মধ্যে উচ্চজাত ও মুসলমানদের মধ্যে আশরফ শ্রেণীর ছেলেরা ছাড়া বিশারদ হবার সুযোগ বিশেষ কেউ পেত না। এর বাইরে সর্বসাধারণের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে পারত। পাঠশালার শিক্ষক গুরুমশায় বা পণ্ডিত বলে পরিচিত ছিলেন। এঁরা মুসলমান বা হিন্দু অন্তজ জাতির লোক হলেও কোন বাধা ছিল না। এই পাঠশালার শিক্ষা নিয়ে আজ কয়েকটা কথা বলব।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান শুরু করে। ১৮০২ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত বিভিন্ন

পর্যায়ে অনুসন্ধান চলে। এর ফলে আমাদের দেশের চার প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রভূত তথ্য জানা যায়। ১৮২৩ সালে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের পরোক্ষ হিসাব অনুযায়ী বিহার ও বাংলায় এক লক্ষ পাঠশালা ছিল।[২] তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক সমীক্ষা করেছিলেন উইলিয়ম অ্যাডাম। সরকারের নির্দেশে সমীক্ষা করে অ্যাডাম তিনটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। অ্যাডামের তিনটি রিপোর্টই বিখ্যাত। অ্যাডাম হিসেব করে দেখিয়েছেন যে এক লক্ষ পাঠশালা থাকলে প্রতি চারশজন লোক পিছু একটা করে পাঠশালা থাকে এবং ৩১ বা ৩২টি বালক পিছু একটা করে পাঠশালা হয়। সরেজমিন সমীক্ষা করে অ্যাডাম দেখেছিলেন অধিকাংশ গ্রামেই অন্তত একটা করে পাঠশালা আছে। একাধিক পাঠশালাও অনেক গ্রামে ছিল। বর্ধমান জেলায় অ্যাডাম দেখেছিলেন একটি গ্রামে ছিল সাতটি পাঠশালা। আর একটি গ্রামে ছয়টি এবং অপর একটি গ্রামে পাঁচটি। নয়টি গ্রামে পাঠশালা ছিল তিনটি করে।

তখন বাংলা ও বিহারে গ্রামের সংখ্যা ছিল ১,৫০,৭৪৮। অধিকাংশ গ্রামে এক বা একাধিক পাঠশালা থাকলে পাঠশালার মোট সংখ্যা এক লক্ষ না হলেও কাছাকাছি হবে। সংখ্যা নিয়ে এত কথা বললাম এই জন্য যে অ্যাডামের নামে সুনির্দিষ্ট ভাবে এক লক্ষ পাঠশালার কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে সংখ্যাটা এক লক্ষ কি আশি হাজার বা অন্য কিছু সেটা বড় কথা নয়। আসলে পাঠশালার বিস্তার সম্পর্কে অ্যাডাম অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন।[৩] অনুরূপ কথা বলেছেন উইলিয়ম ওয়ার্ড।[৪] ১৮৪ সালের রিপোর্ট অব দি এডুকেশন কমিশন অব ইণ্ডিয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে।[৫] অ্যাডাম দীনতম লোকের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল বলেছেন।

দীনতম কথাটা জাত ও আর্থিক সঙ্গতি উভয় দিক থেকেই প্রযোজ্য। অ্যাডাম মুর্শিদাবাদ বর্ধমান ও বীরভূম এই তিনটি জেলায় পাঠশালার ছাত্রদের জাতি পরিচয় সংগ্রহ করেছিলেন। এই তিনটি জেলায় মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০,৬৫৩। এর মধ্যে মুসলমান ১,০৮৩, খ্রিষ্টান ছাত্রর সংখ্যা নগণ্য, ৩৩। বাকী অর্থাৎ হিন্দু ছাত্র ১৯,৫৩৭। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রমুখ উচ্চ জাতির ছাত্র ২৮ শতাংশ, নবশাখ জাতিসমূহের ছাত্রসংখ্যা ৪৭ শতাংশ এবং অজলচল ও অন্ত্যজ জাতির ছাত্র ২৫ শতাংশ। অজলচল ও অন্ত্যজ জাতের মধ্যে সুবর্ণবণিকদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা, তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে লেখাপড়া জানা অপরিহার্য। কিন্তু বৃত্তির কারণে লেখাপড়ার প্রয়োজন থাকবার কথা নয়। এমন জাতের ছাত্র ঢের ছিল যথা, কৈবর্ত, জালিয়া, বাগদী, পাশি, মুচি, মালি, ডোম, কলু, শুঁড়ি, ধোপা, চণ্ডাল, হাড়ি, তিয়র, মাল, মেটে, লাহারি। ১১৯৮ সালে লেখা একটি দলিলে একটি পাঠশালার ছাত্রদের নামের তালিকা আছে।

আখড়া, টোল বা মাদ্রাসায় পড়বার জন্য কোন খরচ লাগত না। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূ-স্বামী, নবাব এমন কি বাদশারাও ভূমিদান করতেন।

এছাড়া সম্পন্ন লোকেরা টোল মাদ্রাসার শিক্ষকদের নগদ টাকা, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস বিভিন্ন উপলক্ষে দান করতেন। কিন্তু পাঠশালার গুরুমশায়দের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, বুকানন বলছেন।[৬]

কথাটা সবক্ষেত্রে সমানভাবে খাটে না। অনেক জায়গায় গ্রামের ধনীলোকেরা গুরুমশায়কে বাঁধা বেতন দিয়ে পাঠশালা খুলতেন, সেখানে তাদের বাড়ির ছেলেরা পড়ত আবার গ্রামের অন্য ছেলেরাও পড়তে আসত। এরকম ক্ষেত্রে গুরুমশায় রুজি রোজগারের জন্য ছাত্রদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোধহয় এই সুযোগ ছিল না। সেক্ষেত্রে ছাত্ররাই গুরুমশায়ের ব্যয় নির্বাহ করত। এই বিষয়ে একটু পরেই বলছি। তবে গুরুমশায়কে যা দিতে হ'ত তার পরিমাণ সামান্যই। কিন্তু এটুকু দেবার সামর্থ্যও অনেক অভিভাবকের ছিল না, এদের ক্ষেত্রে গুরুমশায়রা সাধারণতঃ বেতন ও অন্যান্য দেয় মকুব করে দিতেন। অনেকে আবার ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু না নিয়েই পাঠশালা চালাতেন। অ্যাডাম এরকম চিত্রই দেখেছিলেন।[৭]

কবি জসীমউদ্দীনের আত্মজীবনীতে তাঁর পাঠশালার কথা আছে। বর্তমান শতকের প্রথম দিকের ঘটনা। জসীমউদ্দীনের গুরুমশায় অভাবী ছাত্রদের বিনা বেতনেই পড়াতেন। পড়ুয়াদের মত গুরুমশায়দের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী লোক ছিল। ফ্রানসিস বুকানন দিনাজপুরে এরকমই দেখেছিলেন।[৮]

তবে মুসলমান গুরুমশায়দের সংখ্যা বেশি ছিল না। হিন্দু গুরুমশায়দের মধ্যে কায়স্থদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তারপরেই ব্রাহ্মণ। বৈদ্য খুব কম। বাদবাকি নবশাখ থেকে অন্ত্যজ। এদের মধ্যে আছে কামার-কুমার, তিলি, কৈবর্ত, গোয়ালা, সদ্গোপ, তাঁতি, নাপিত, কলু, শুঁড়ি, ধোপা, বাগদি, চণ্ডাল, যুগী, বারুই, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি। প্রাচীন চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ থেকেও অনেক নবশাখ অজলচল ও অন্ত্যজ গুরুমশায়ের নাম পাওয়া যায়। অ্যাডামের রিপোর্ট অনুসারে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূমের হিন্দু গুরুমশায়দের মধ্যে প্রায় ৭৫ ভাগ উচ্চ জাতির এবং ২৫ ভাগ নবশাখ, অজলচল ও অন্ত্যজ জাতিভুক্ত। নীচু জাতের গুরুমশায়ের কাছে উঁচুজাতের ছাত্ররাও পড়তে যেত। অ্যাডামের মুর্শিদাবাদের রিপোর্টে সেকথা আছে।[৯]

গুরুমশায়দের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পাঠশালা চালাতেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল অকাতরে বিদ্যা দান। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকতা ছিল গুরুমশায়দের জীবিকা। আয় বেশি হ'ত না। ধনীলোকে অনেক সময় গুরুমশায়দের বাঁধা মাইনে দিয়ে গ্রামে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করতেন। এরকম ব্যবস্থা না থাকলে ছাত্ররা হয়ত প্রতিমাসে দক্ষিণা দিত। দক্ষিণার পরিমাণ ছিল অবস্থা বিশেষে দু-আনা থেকে আট আনা। নিয়মিত বেতন দেবার সামর্থ্য না থাকলে মাঝে মাঝে খোরাকি বাবদ কিছু নগদ পয়সা। দু-আনা বা তিন আনা যাই হোক—কোথাও ছাত্ররা যে যেমন পারল চাঁদা দিয়ে কিছু টাকা তুলে দিত। এর পরিমাণ দু-তিন টাকার বেশি হ'ত না। এ ছাড়া গুরু-

মশায়কে সিধা দেবার প্রথা ছিল। শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি উপলক্ষে কিছু দক্ষিণা দেওয়া হত। দুর্গাপূজার সময় গুরুমশায়রা নগদ পয়সায় বা নতুন কাপড় পার্বণী পেতেন। অবস্থা বিশেষে পার্বণীর পরিমাণ ন্যূনপক্ষে আট আনা আর উর্ধ্বপক্ষে সাত আট টাকা পর্যন্ত উঠত। সবরকম মিলিয়ে গুরুমশায়েরা যা পেতেন তাতে মাসে তিন-চার থেকে সাত-আট টাকা আয় হ'ত।

ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য গুরুমশায়দের সঙ্গে অভিভাবকদের চুক্তি হ'ত এমন প্রমাণ আছে। নওয়াপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রী শেখ কালাচাঁদের সঙ্গে কাচগড়্যা নিবাসী গুরুমশায় শ্রী সনাতন সরকারের এই রকম চুক্তির দলিল পাওয়া গেছে। ১২৬৬ সালের ১৩ শ্রাবণ তারিখে শেখ কালাচাঁদ একরারনামা লিখে গুরুমশায়কে বলছেন :

"আমার পুত্র শ্রী কোজলুল হোসেন ও শ্রী তথুদ্দক হোসেন আপনার নিকট লেখাপড়া করিবার কারণ পাট কেলট্ট কট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাস বাংলা হিসাবে ও হরফে ও ইস্তিহামে পুরা করিআ দিবেন সন ১২৬৬ সাল নাং সন ১২৬৭ সাল মাহ আশ্বীন তক তৈয়ার করিয়া দিবেক আর আমার নিকট দরমাহা মাঘ মোট চুক্তি সর্ব্বসুদ্ধা কোং ২৫৲ পৌচিষ টাকা দিবো টাকার করাবে, কি মাহাতে ।। আট আনা দিবো ...পরে ইস্তিহাম পুরা করিয়া ইস্তাম নিয়া আপনার মাহিনে হিসাব করিআ দিবো আর এই করারের ভিতর তৈয়ার করিআ না দিতে পার তবে আমার টাকা ফেরত আপনার ঠাই চাইবো ।।"

গুরুমশায় সনাতন সরকার এই চুক্তি মেনে নিয়ে শেখ কালাচাঁদকে লিখছেন যে এক বছরের মধ্যে ছেলে দু-টিকে তিনি যথোপযুক্ত শিক্ষা দেবেন। তবে,

"উক্ত ছাত্রদিগকে ত্বআর না করিআ দিতে পারি তবে আপনার টাকা ফিরৎ দিবো আপনার পুত্রদিগের সাভালি করিআ কামাএগী করে এবং অন্য কোন উজর হয় তবে আমি মহাশয়কে চিটী লিখিয়া জানাইবো।"[১০]

উপার্জন কমের দিকে হ'লে পাঠশালায় পড়িয়ে সংসার প্রতিপালন করা যেত না। তাই গুরুমশায়দের অনেকেই বংশানুক্রমিক বৃত্তি বা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করতেন। গুরুমশায়দের অনেকেই চাষ করতেন বা তাঁত চালাতেন বা দোকানদারি বা পৌরোহিত্য করতেন। একজন তাঁতি গুরুমশায়ের কথা অ্যাডাম লিখেছেন। ইনি দিনে কাপড় বুনতেন এবং রাত্রে পাঠশালায় পড়াতেন। সাধারণতঃ গুরুমশায়দের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। উপার্জন একটু বাড়ানোর আশায় গুরুমশায়রা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ছাত্র সংগ্রহ করতেন। বোধ করি, গুরুমশায়দের দৈন্যও শিক্ষা বিস্তারের একটা উপলক্ষ হয়ে থাকবে। অন্তত অ্যাডাম সেইরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' গ্রন্থে পাঠশালার বিবরণ আছে। দীনেন্দ্রকুমারও গুরুমশায়ের ছাত্রসংগ্রহ অভিযানের উল্লেখ করেছেন।

অনেক গ্রামেই পাঠশালা বলে স্বতন্ত্র কোনো ঘর থাকত না। কারও বাড়ির

চণ্ডীমণ্ডপে বা বৈঠকখানায় বা দাওয়াতে অথবা দোকানের চালায় পাঠশালা বসত। এরকম কিছু না পাওয়া গেলে গ্রামের সদর জায়গায় বড় গাছের নীচে পাঠশালার কাজ চলত। কিছু কিছু গ্রামে আলাদা পাঠশালা ঘর ছিল। সে ঘর হয়ত কোনো ধনী-লোকের করে দেওয়া। অথবা কারও দেওয়া জমিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগ আয়োজন করে ঘর তুলে নিয়েছে। গুরুমশায় ও ছাত্ররা মিলে ঘর তুলে নিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে।

পাঠশালা চালাবার জন্য ব্যয় হত সামান্যই। পাঠশালার উপকরণ বলতে কিছুই ছিল না। গুরুমশায় মাটিতেই বসতেন। আসনটিও তাঁর নিজের। ছাত্ররা বসবার আসন, লেখার সরঞ্জাম নিজেরাই নিয়ে আসত। বাড়িঘরের কথা তো এখনই বললাম। গুরু-মশায়ের ভরণ-পোষণ হ'ত ব্যক্তিবিশেষের দানে অথবা ছাত্রদের আয়োজনে। দেখা যাচ্ছে, যা কিছু প্রয়োজন তার সংস্থান গ্রামের লোকে নিজেরাই করে নিত। এর জন্য তারা কারও মুখাপেক্ষী হ'ত না। গ্রামসমাজের স্বয়ম্ভর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাতেই লেখাপড়ার আয়োজন হ'ত। গ্রামের সহায়-সম্বল দিয়ে কামার কুমার ধোপা নাপিত প্রভৃতি প্রতি-পালিত হ'ত। ওইভাবেই পাঠশালা ও গুরুমশায়কে গ্রামসমাজ প্রতিপালন করত।[১১] লেখাপড়া শেখা গ্রামীণ জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল। গ্রামের চাষীবাসী কারিগর ভদ্রলোক সকলেই এই শিক্ষার গুরুত্ব বুঝত এবং ছেলেরা যাতে এই শিক্ষা পায় তার জন্য চেষ্টা করত।

পাঠশালায় কী শেখান হ'ত এখন তার আলোচনা করব। পাঠশালা সম্পর্কে দ্বিজ রামদুলাল রায়ের একটি পুঁথি আছে। পুঁথির একজায়গায় শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়ছি :

অষ্টাদশ ছাওয়াল পড়িছে নিরন্তর
অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর ॥
বিবিধ প্রকার অঙ্ক শিখিয়াছে সভে।
অষ্টকোঠা অষ্টপর শিক্ষা করে ইবে ॥
সরকার বেড়িয়া সভে বস্যে ডানি বাঁ
অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খাঁ ॥
তিলির নন্দন তার নাবাঙ্গিতে বাস
কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাশ ॥
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবি ছান্দে কয়
অঙ্কে হল্যে অস্থির সুস্থির কর্য্যা লয় ॥[১২]

দেখা যাচ্ছে অঙ্কের ওপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। পাঠশালার পাঠ্য বিষয় দেখলে বোঝা যায় যে গ্রামীণ সমাজের ব্যবহারিক জীবন সুষ্ঠুভাবে চালাবার মত উপযুক্ত শিক্ষা গুরুমশায়রা দিতেন। পড়া এবং লেখা শেখার সঙ্গে অঙ্কশিক্ষার ওপর খুব

জোর দেওয়া হ'ত। হিসাব রাখা ও খাতা লেখা বেশ ভালভাবে শেখান হত। সাধারণতঃ অঙ্ক ও হিসাব শেখান হত শুভঙ্করের আর্যা ধরে। সব গুরুমশায়ের কাছেই শুভঙ্করের পুঁথি থাকত। তবে উগ্র বলরামের পাটীগণিতও চালু ছিল। এতে নানাপ্রকার সমস্যা পূরণের পাঠ দেওয়া আছে। কৃষি ও ব্যবসার হিসাব পৃথকভাবে শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। কিছু পাঠশালাতে দু-রকমই শেখান হত। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেত যে গুরুমশায়রা হয় কৃষি নতুবা ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাব শেখাচ্ছেন। এ ছাড়া ব্যবহারিক বিদ্যা হিসেবে শেখান হত বিভিন্ন প্রকার সম্বোধনসহ চিঠি লেখার বয়ান, পাট্টা, কবুলতি, অর্পণনামা, একরারনামা, দরখাস্ত, হুণ্ডি, জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলের বয়ান। জমিজমা সংক্রান্ত নিয়মকানুন শেখানোর জন্য মহলকালি পুঁথি প্রচলিত ছিল। এতে সহজভাবে সরল ভাষায় নিয়মকানুন বোঝানো আছে।

বীরভূম জেলার খুজুটিপাড়া গ্রাম থেকে পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ৯৮ প্রকার গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এটি ১২৭২ সালে অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের তারিখ যুক্ত। গ্রন্থটি ব্যাপক। এর সব কিছু যে প্রত্যেক পাঠশালায় শেখান হ'ত তা মনে করবার কারণ নেই। তবে কী শেখান উচিত তার তালিকা হিসেবে গ্রন্থটি খুব মূল্যবান।[১৩]

গ্রন্থের প্রথম দিকে আছে অক্ষর শিক্ষা, যুক্তাক্ষর বানান শিক্ষা, এরপর কড়া গণ্ডা প্রভৃতি অঙ্কের ধারাগুলো মুখস্থ করবার কথা। এর ফলে শস্য কেনাবেচা, মজুর মাহিন্দারের মাস মাইনে, বাৎসরিক মাইনের হিসাব নিকাশ শেখা হ'ত। তার পরে আছে সোনা রূপা পিতল কাঁসা কেনাবেচা সম্পর্কিত হিসাব।

মহাজনীর জন্য আছে সুদকষা, মুদিআনী প্রভৃতি ব্যবসার জন্য আছে পসারি জায়, মণকষা, বিশা খরিদবিক্রি ও ওজনের নিয়মাবলী।

মাপজোকের জন্য শেখাবার কথা ইট-কালি, নৌকা-কালি, পুষ্করিণী-কালি। কিছু জ্যোতিষ শেখাবার কথা আছে। কবিরাজী চিকিৎসার অনুপান বিষয়ে জ্ঞান দেবার জন্য চিকিচ্ছার তোলার পরিমাণ সম্পর্কে বলা আছে। ঠিকাদারী প্রভৃতি কাজের জন্য পাকা রাস্তার মাপ।

তারপরে রয়েছে 'চিঠিপত্র লিখিবার ধারা', 'গ্রাম লিখিবার ধারা', 'নাম লিখিবার ধারা', 'খত লিখিবার পদ্ধতি'। জমা গুজস্তার খাজনা, দখিলা, খতপাট্টা, কবুলতি, খোস কবলা, কট কবলা, ইজারা বন্দক, হুকুমনামা, পাট্টা কবুলতি প্রভৃতি জমিদারী সংক্রান্ত বিষয় ছিল পাঠশালার পাঠ্য।

এর পরে আছে আইন ও বিচার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পাঠ।

গ্রন্থটি দেখলে মনে হয় গৃহস্থের ছেলেকে ব্যবহারিক জ্ঞানে পাকাপোক্ত করে তোলাই ছিল পাঠশালা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

জ্ঞানকৌমুদী নামে একটা পুঁথি পাওয়া গেছে, এটা পাঠশালায় ব্যবহার করা

হ'ত। এই গ্রন্থ ধরে হিন্দু ছাত্রদের 'লিখনের পাটাপাট' অর্থাৎ বিভিন্ন সম্পর্কের ব্যক্তিকে উপযুক্ত সম্বোধনসহ চিঠি লেখবার পদ্ধতি শেখান হ'ত। মুসলমান ছাত্রদের চিঠিপত্র লেখা শেখাবার জন্য স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত ছিল। 'মোছলমানের প্রকরণ' অনুসারে পীর মুরিদ ও বিভিন্ন আত্মীয় সম্পর্কের লোককে 'খত' লেখার স্বতন্ত্র 'সেরেস্তা' শেখাবার পুঁথিও পাওয়া গেছে।

পাঠশালার পাঠ্যবস্তু ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে একখানি অতি মূল্যবান কড়চা বা সংকলন পাওয়া গেছে। এতে নারায়ণ দাস, শুভঙ্কর দাস, গোপাল, হরেকৃষ্ণ ঘোষ, রামনারায়ণ, দ্বিজ রামদুলাল রায়, শোভারাম, কিঙ্কর, নন্দরাম ও কৃপারামের ভণিতায় পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতির কথা সংকলিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে শিক্ষিত লোকেরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতেন।

এর পরে বলতে হয় ভাষা, সাহিত্য ও নীতিশিক্ষার কথা। কিছুটা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান হত। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। অষ্টশব্দী ও অষ্টধাতুর পুঁথি গুরুমশায়রা রাখতেন, অমরকোষ অবলম্বন করে কিছুটা সংস্কৃত ব্যাকরণ আর শব্দসম্ভার ধরে শেখান হত শব্দের ব্যুৎপত্তি।[১৪]

পাঠশালায় সংস্কৃত বিদ্যা বেশি শেখান হ'ত না ঠিকই। কিন্তু গুরুমশায় এবং পড়ুয়াদের জাতি পরিচয়ের কথা মনে রাখলে পাঠশালায় এইটুকু সংস্কৃত পাঠও খুব বড় কথা। কারণ সাধারণভাবে আমরা জানি যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন অন্য কারও সংস্কৃতে অধিকার ছিল না। সুকুমার সেন লিখেছেন যে রাঢ়ের কয়েকটি জায়গায় ডোমজাতের পণ্ডিত চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত পড়াতেন। ডোম পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠী বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও ছিল।

বাংলা কবিতা বলতে সরস্বতী বন্দনা, গুরুবন্দনা এবং গুরুদক্ষিণা অবশ্য পাঠ্য ছিল। এ ছাড়া গঙ্গাবন্দনা, যোগাদ্যাবন্দনা, মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, বাংলা গীতগোবিন্দ, দাতাকর্ণ মহাভারতের আদিপর্ব এবং হাতেমতাই প্রভৃতি কাব্য পড়ানো হ'ত। এই আখ্যানগুলো থেকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হত। তবে নীতিশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রচলিত ছিল। এইরকম একটা গ্রন্থের নাম শিশুজ্ঞানচরিত্র। গ্রন্থটি কবিতায় রচিত। রচয়িতার নাম দ্বিজ দুর্গারাম। এই গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

বিদ্যার কারণে পূর্বে শ্রীনন্দের নন্দন
ব্রাহ্মণের ভৃত্য হয়্যা সেবিল চরণ
বিদ্যার কারণ হেতু রাম দামোদর
পড়িবারে গিয়াছিল অবন্তি নগর
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না পায় ধিয়ানে
হেন হরি পড়িল পাঠ গুরুর সদনে
যাহার শরীরে বিদ্যা সেই মহাজন

বিদ্বান হইলে সর্বত্র পূজিত সেইজন।
... ...
জন্ম দিয়া পিতামাতা কোন কর্ম করে।
মূর্খ পুত্র হইলে গালি দিয়া যায় পরে॥
পিতা হইয়া পুত্রে যদি পাঠ না পড়ায়
কি কব তাহার কথা পুত্রবধ পায়॥[১৫]

কোন কোন বিদ্যা শেখা উচিত দুর্গারাম তার আলোচনা করেছেন। অক্ষর পরিচয়ের পর শিখতে হবে সংখ্যা, তারপর বানান। গুরুদক্ষিণা পড়তে হবে, খত, পাট্টা পড়তে ও লিখতে শেখা দরকার। কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি অঙ্ক শিখতে হবে। তারপরে

শব্দস্যে খত শিখ জায় হবে জ্ঞান।
মুখের জড়তা যাবে পড় অভিধান॥

অতঃপর দুর্গারাম পিতামাতা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সঙ্গে ভক্তিযুক্ত আচরণ করতে উপদেশ দিয়ে বলছেন :

"পিতামাতা জ্যেষ্ঠভাই করিয়া মার্জন।
বিষতুল্য দেখিবে পরের অমূল্য ধন॥
পড়ুয়া পড়ুয়া দ্বন্দ্ব না করিহ কেহ।
মনে কর সকলে হইবে একাগ্রহ॥"

অর্থাৎ পাঠশালায় সব ছাত্র এক গৃহের অধিবাসীর মত থাকবে। এটা মৌলিক মানবতাবোধের কথা।

দুর্গারাম শিশুদের জন্য আর্যা লিখেছিলেন। আর্যার মধ্যে উপদেশক্রমে দুর্গারাম বলছেন :

বিষদন্ত ভাঙ্গিলে ভুজঙ্গ হয় জরা।
চক্ষু থাকিতে অন্ধ বিদ্যাহীন যারা॥
শিশুকালে না পড়িলে দ্বিজ দুর্গারাম কয়।
মনোদুঃখে মারা যাবে যৌবনসময়॥

দলিলপত্র লেখার ও বোঝবার বিদ্যা শেখাবার জন্য শুভংকরের নামে আর্যা প্রচলিত ছিল। বিধি নিয়ম বুঝিয়ে বলবার পর শুভংকর বলছেন :

কাগজ লিখিবার যদি থাকে অভিলাষ।
কায়মন বাক্যে ইহা করিবে অভ্যাস॥
ইহা না জানিয়া যেবা কাগজে অবেসে।
মিছা পরিশ্রম তার হয় দৈবদোষে॥

জলেতে সাঁতার নাহি জানে যেইজন।
অগাধ নদীতে নামে করিয়া তর্জন॥
পার নাহি হয় সে স্রোতে হয় ভাসা।
স্যাখত বিহিন জনার হয় সেই দসা॥

পাঠশালা বসত দিনে দু-বার, প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে। বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্ররা একত্রে পড়ত। কিন্তু পাঠশালায় সাধারণতঃ মাত্র একজন গুরুমশায় থাকতেন। গুরুমশায় প্রত্যেককে পৃথকভাবে পাঠ দিতেন। ছাত্রকে পাঠশালায় বসে পাঠ অভ্যাস সেটা লিখে ফেলতে হ'ত। তারপর দিনান্তে গুরুমশায় বা একজন সর্দার পড়ুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে সেটা পড়ে দেখাতে হ'ত যে তার কতদূর রপ্ত হয়েছে। অনেক সময় গুরুমশায়রা পুঁথিপত্র দেখে পড়া দিতেন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পুঁথিপত্র সামনে না রেখে যেমন যা মনে থাকত তেমন পড়া দিতেন। প্রত্যহ দিনান্তে ছাত্ররা একত্রে দাঁড়িয়ে সর্দার পোড়ো বা গুরুমশায়ের কাছে নামতা ও বানান অভ্যাস করত। এছাড়া নিয়মিত আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে ছাত্রদের যোগ্যতা ও উৎকর্ষ যাচাই করবার কতগুলো পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই রকম একটা পদ্ধতির কথা লালবিহারী দে লিখেছেন। এর নাম ঘোষা। বাড়ির কর্তা বা কর্তৃস্থানীয় কেউ বাড়ির ছেলেদের ও প্রতিবেশী ছেলেদের একত্রে দাঁড় করিয়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। এই পরীক্ষার সময় ছাত্রদের হাতে লেখার কোনো সরঞ্জাম দেওয়া হত না। মুখে মুখে অঙ্ক কষতে হ'ত ও বানান বলতে হত। লালবিহারী বলছেন, ঘোষা পদ্ধতি দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল।[১৬]

আর এক রকম ছিল পুঁথি বন্ধক রাখা। পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের কাছে পুঁথি বন্ধক রেখে বসত। পরীক্ষক তাকে ছড়া কেটে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। ঠিকমত উত্তর দিতে পারলে পুঁথিটি পরীক্ষার্থী ফেরৎ পেত। না পারলে পরীক্ষক পুঁথিটি বাজেয়াপ্ত করে নিতেন। এবং অসফল পরীক্ষার্থীকে আবার গুরুর কাছে পাঠ নিতে হ'ত। এই রকম প্রশ্নোত্তরের পঁুথি প্রচলিত ছিল। খানিকটা আধুনিক কালের নোট বইয়ের মত। একটা পঁুথি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

বিনয় করে একটি কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
তুমি কেমন সুবোধ শান্ত বুদ্ধিমন্ত বুঝিব এবারে॥
তোমার মুখে শুনিব সুখে অদ্ভুত কাহিনী।
ধর্মের জন্মের কথা কহ দেখি শুনি॥
কহ দেখি আদ্যের শক্তির জন্ম বিবরণ।
কোথায় জন্মি ব্রহ্মা অগ্নি হুতাশন॥
কোথায় জন্মিয়া মেঘ করায় গর্জন।
কোথায় জন্মিল মালা তিলক চন্দন॥

কহ দেখি চন্দ্র সূর্য দুইজন কাহার নন্দন।
কহ দেখি পৃথিবীর মধ্যে অবষ্টব কোন জন॥

এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে প্রশ্নকর্তা বলতেন,

সারদা দোহাই দিয়া ধরিলাম পুঁথি।
পুস্তক ছাড়াইয়া লহ যদি থাকেন শকতি॥
যদ্যপি পুস্তক তুমি ছাড়াইতে নার।
পুনর্বারি গুরুর স্থানে অধ্যয়ন কর॥

যাকে প্রশ্ন করা হল সে এক এক করে উত্তর দিয়ে শেষে বলত—

আমাদের শিক্ষাগুরু শ্রী অমুক মহাশয়।
তার ঠাঁই পড়ি পাঠ শুন মহাশয়॥
সরস্বতি পদে মোর বিস্তর প্রণতি।
বিনয় করিয়া কহি ছাড়াইয়া পুঁথি॥

ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়। তখন এই ব্যবস্থার বহু ত্রুটি পর্যবেক্ষকদের চোখে পড়েছিল। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠশালায় কিছুই শেখান হ'ত না। অঙ্ক শিক্ষায় যোগ বিয়োগের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হ'ত। কুড়ির বেশী সংখ্যা দিয়ে গুণ শেখান হ'ত না। নামতা অভ্যাস করান হত মুখে মুখে। পড়ুয়ারা একত্রে চীৎকার করে সমস্বরে আবৃত্তি করত। এইভাবে শেখবার ফলে গুণন ভাগ ভালভাবে অধিগত হ'ত না। সাধারণভাবে শেখাবার পদ্ধতিতে ত্রুটি ছিল। যান্ত্রিকভাবে মোটামুটি ধরনে শেখান হ'ত। গুরুমশায়রাও অনেকে শিক্ষাদানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। পুঁথিপত্র খুব একটা ব্যবহার করা হ'ত না। ফলে গুরু-মশায় কী লেখাচ্ছেন, ঠিক কি ভুল তা বোঝা যেত না। ভুল হলে সংশোধনের উপায় ছিল না। বিশেষ করে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও বানান সম্পর্কে এই সমস্যা খুবই প্রকট ছিল। গুরুমশায়রা অনেকেই এইসব বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। শব্দের অর্থ লোকব্যবহারে নির্ধারিত হ'ত এবং বানান হ'ত উচ্চারণ অনুযায়ী। বাংলা দেখলেই বোঝা যাবে এই সমস্যা কতদূর জটিল হ'তে পারে। আড়ষ্ট বা অপরিশীলিত জিহ্বায় উচ্চারণের দরুণ বানান যদ্‌চ্ছে বিকৃত হত এবং তার ফলে অর্থের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ঘটত।

আর একটা সমস্যা ছিল গুরুমশায়দের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুমশায়দের আর্থিক অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল সে কথা আগেই বলেছি। অ্যাডামের মতে সমাজে তাঁদের মানও বিশেষ ছিল না।[১৭] পরবর্তী সময়ে লালবিহারী দে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনেন্দ্রকুমার রায় পাঠশালার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে গুরুমশায়দের সামাজিক মর্যাদা

বিশেষ ছিল না। বলা যেতে পারে, তাঁদের অবস্থাটা গ্রামের পুরোহিত ব্রাহ্মণদের মত ছিল। আনুষ্ঠানিক সম্মান তাঁরা কিছুটা পেতেন। কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা কেউ করত না। এমনকি ছাত্ররাও নয়। গুরুমশায়কে হয়ত তারা ভয় করত, কিন্তু আড়ালে অবজ্ঞা করত। অন্যদিক দিয়ে চিন্তা করলে পাঠশালা শিক্ষার ইতিবাচক গুণগুলো চোখে পড়বে। ব্যবহারিক শিক্ষা হিসেবে এর কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা অনস্বীকার্য।[১৮]

অ্যাডামের উক্তি বিচার করার সময় মনে রাখতে হবে যে পাঠশালা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কোন সংগঠন ছিল না। রাষ্ট্রের কোন অনুদানও থাকত না। সম্পূর্ণরূপে গ্রামের অভ্যন্তরিক সহায়-সম্বল নিয়েই পাঠশালা চলত। গ্রামের কোন ধনী-লোক যদি পাঠশালার ঘর করে দিতেন বা জমি দিতেন অথবা গুরুমশায়দের বেতন দিতেন তা হ'লে তাতেই চলত। এ সুযোগ না থাকলে গ্রামের লোকে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পাঠশালা বসাবার ব্যবস্থা করত। বৃত্তি দিয়ে, সিধা দিয়ে, খোরাকি, পার্বণী দিয়ে গ্রামের লোকে নিজেরাই গুরুমশায়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিত। এই স্বনির্ভরতাই পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং এর ফলেই শিক্ষার প্রসার হয়েছিল। লেখাপড়া শেখার আগ্রহ সাধারণ লোকের মনে না থাকলে এটা সম্ভব হ'ত না। আর একটা বড় কথা এই যে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই সারা দেশে পাঠশালার পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতির একটা মান প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতকের সব পর্যবেক্ষকের চোখেই শিক্ষা দেবার এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের কতগুলো নির্দিষ্ট নীতি ও রীতি ধরা পড়েছে। সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার মধ্যে এইরকম নির্দিষ্ট মান কী করে গড়ে উঠল এবং সারা দেশে প্রচলিত থাকল সেকথা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। সমাজে শিক্ষা লাভের আগ্রহ আছে, সেই সমাজ গ্রামীণ গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নিজস্ব সংগঠন চালু রেখেছে, মান বজায় রেখেছে, বাইরের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয়নি—এই ঘটনার সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য উপেক্ষা করা চলে না। গ্রামের মধ্যে ভেদাভেদ শাসন-শোষণ সবই ছিল, কিন্তু ভেদ সত্ত্বেও সবাই একত্র হয়ে এই কাজটা করত। সব জাতের ছেলে একজায়গায় এক গুরুমশায়ের কাছে লেখাপড়া করত। অ্যাডাম বলছেন গুরু-মশায় নীচুজাতের হলেও অসুবিধা হত না। আবার নানা জাতের ছেলে একত্রে পড়বে, এতেও লোকে আপত্তি করত না।[১৯]

১১৯৮ সালের একটা দলিলে একটি পাঠশালার ছাত্রদের নামের তালিকা আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ ছাত্রদের সাথে একত্রে পড়ছে ভুঞা, বণিক, নায়ক, ঘোষ, চং, গো পদবীধারী ছাত্রগণ।

উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সব জাতের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ছিল বলেই এবং সমবায়মূলক গ্রামসমাজের সাংগঠনিক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল বলেই পাঠশালার বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষাব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে চালু ছিল।

বুকানন, অ্যাডামের সমীক্ষার সময়, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই পাঠশালা

শিক্ষাপদ্ধতির অবনতি শুরু হয়েছে। অ্যাডাম নিজেই দেখেছিলেন, যে আগে পাঠশালায় অনেক বেশী জিনিস আরও ভালভাবে শেখান হ'ত। তাঁর সমীক্ষার সময় সে সব জিনিস ক্রমশ উঠে যাচ্ছিল। আগে যেসব বিষয় পড়ান হ'ত, বিশেষ করে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে, তার একটা তালিকা দিয়েছেন অ্যাডাম।[২০]

পাঠশালায় পড়ান হত বাংলাভাষায়। কিছুটা সংস্কৃত পড়ান হ'ত বটে, কিন্তু পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করে টোলে পড়তে যাওয়া চলত না। দু-চারজন ব্রাহ্মণ সন্তান পাঠশালা থেকে আখড়া গিয়ে পড়াশোনা করে টোলে গিয়ে পড়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। পাঠশালা, আখড়া, টোল—পাঠক্রম এইভাবে সাজান যায় না। কিন্তু পাঠশালার বিদ্যা শুধুমাত্র বিষয়কর্মেই কাজে লাগত, তা নয়। সমাজে লেখাপড়ার নিয়ত চর্চা হ'ত। এই কথার স্বপক্ষে কিছু তথ্যপ্রমাণ দেওয়া সম্ভব।

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা পুঁথি সংগ্রহের অন্যতম আদি পুরুষ। বহুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন যে বেশীরভাগ বাংলা পুঁথি তিনি পেয়েছেন নিম্নতর জাতিভুক্ত লোকের বাড়ি থেকে। দীনেশচন্দ্রের এই উক্তির তাৎপর্য অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি। দেখলে মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক জীবন সম্পর্কে নতুন ভাবে আলোচনার সূত্রপাত হ'ত।

ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে বিপুল সংখ্যক বাংলা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি সংগ্রহে মুখ্য প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ পুঁথিতেই পুষ্পিকা থাকে। পুষ্পিকা বহু তথ্যের আকর। এতে লিপিকাল, লিপিস্থান, লিপিকারের নাম, পুঁথির মালিক বা পাঠকের নাম, লিপিকার ও মালিকের বাসস্থানের উল্লেখ থাকে। এছাড়া গ্রন্থটি যদি বিক্রয়ার্থে লিপি করা হয় তবে মূল্যের পরিমাণ এবং লিপিকারের পারিশ্রমিকের পরিমাণও উল্লিখিত থাকে। সুতরাং বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় পুষ্পিকার গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। পুষ্পিকা থেকে কিছু কিছু তথ্য সংকলন করে এখানে কয়েকটা কথা বলব।

পুষ্পিকায় নাম অধিকাংশই পদবীযুক্ত। পদবী দেখে জাতি বোঝা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। কিছু কিছু পুষ্পিকায় নামের সঙ্গে জাতির পরিচয়ও দেওয়া আছে। লিপিকার ও গ্রন্থাধিকারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রমুখ উচ্চজাতির সংখ্যা মন্দ নয়। তবে নবশাখ, অজলচল ও অন্ত্যজ জাতের সংখ্যাই বেশী। সব জাতির মধ্যে যদি লেখাপড়ার প্রচলন থাকে তবে এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না উচ্চজাতি সংখ্যালঘু। পুঁথি নকল করা তখনকার দিনে কিছু লোকের পেশা ছিল। অক্ষরের ছাঁদ ভাল হলে অনেকে এই পেশা অবলম্বন করতেন। পুষ্পিকায় কিছু লিপিকারের আত্মপরিচয় আছে। তাতে দেখা যায় যে এরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই কাজ করে গেছেন। লিপিকারদের মধ্যে যুগী, কৈবর্ত, ধোপা, গরাই ও ডোম জাতির লোক আছে। নিম্নতর জাতির লিপিকাররা উচ্চজাতির লোকের জন্য ধর্মগ্রন্থ নকল করে দিয়েছেন। পুঁথির মালিক পাঠক ও ক্রেতাদের

মধ্যে আছেন গন্ধবণিক, তাম্বুলি, বারুই, কুম্ভকার, সদ্গোপ, তাঁতি, ময়রা, তেলি, কৈবর্ত, ছুতার, যুগী, শুঁড়ি, ভূঁইমালি, ডোম, কোটাল, বাগদী, মাল ও পোদজাতীয় বিদ্যোৎসাহী লোক। এঁদের তালিকায় রামায়ণ-মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল ও বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক আখ্যান গ্রন্থাদি বহু আছে। এগুলো নিয়ে বেশী কিছু বলবার নেই। এঁদের পঠিত অন্য কতকগুলো গ্রন্থের কথা উল্লেখ করব। গ্রন্থগুলি বিষয়গুণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোট একটা তালিকা দিচ্ছি : শ্রীকৃষ্ণভক্তিকল্পী, সনৎকুমার পটল, রসপুর কারিকা, ভক্তিচিন্তামণি, ক্রিয়াযোগদার, রসকদম্ব, ভাবাবেশগ্রন্থ, তত্ত্ববিলাস, স্বরূপবর্ণন নিগমগ্রন্থ, ভ্রমরগীতা। এ গ্রন্থগুলি তত্ত্বমূলক। শেষ দু-খানি বাদে বাকি সবগুলো গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী, বিশেষ করে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব এবং গোপাল ভট্ট অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রচারের জন্য অধিবিদ্যা, অধ্যাত্মতত্ত্ব, রসশাস্ত্র ও স্মৃতি সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থসম্ভার প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিয়ত তাত্ত্বিক বিচার দ্বারা ভারতে প্রচলিত অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও মতসমূহ থেকে নিজেদের বিশিষ্টতা প্রতিপন্ন করা। গোস্বামীদের সম্ভবতঃ আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার চৈতন্য পরিকর নিত্যানন্দ গদাধর দাস বা নরহরি সরকার অনুভব-নির্ভর গৌরপারম্যবাদ প্রচার করছিলেন। বাংলায় চৈতন্যদেবের নাম প্রচার এঁরাই করেছিলেন কিন্তু গোস্বামীদের অনভিপ্রেত। দ্বিমুখী সংগ্রামে গোস্বামীগণ বহুল তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করে ও যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সর্বসাধারণের জন্য গোস্বামী-মতাবলম্বী প্রচারকগণ গোস্বামী-গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। বাংলায় গোস্বামী মত প্রতিষ্ঠিত হলে গোস্বামী গ্রন্থসমূহের আদর বাড়তে থাকে। তেলি, মালি, যুগী, কৈবর্ত, ডোম, বাগ্দী, কোটাল, পোদ জাতির লোক এইসব গ্রন্থ পাঠ করছে এই ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ এর সামাজিক ইঙ্গিত অতিশয় গভীর। প্রশ্নটা শুধুমাত্র ব্যবহারিক লেখাপড়া জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে তত্ত্বচিন্তা ও তত্ত্বালোচনার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[২১]

ব্যবহারিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনে শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল এ কথা ঠিক। সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে জমিজমা, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিলি ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু সমাজে জ্ঞানচর্চা প্রসারের কারণ সম্ভবতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ। বৃন্দাবন গোস্বামীদের শিষ্যমণ্ডলী, নরোত্তম দাস, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ পাল এবং এঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে রাগানুগা মত এবং সহজিয়াপন্থীদের গ্রাস করে ক্ষেত্রবিশেষে অতিক্রম করে গোস্বামী মতই বাংলায় সমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঙালী হিন্দুদের আনুমানিক তিন-চতুর্থাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাবলম্বী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কথাটি শাস্ত্রীয় অভিধা।

চৈতন্যদেব নিজে দশনামী সন্ন্যাসী হলেও ধর্মাদর্শে মাধবাচার্যের পরিপোষক ছিলেন বলে তার সাম্প্রদায়িক পরিচয় মাধ্বী। এই সূত্রে চৈতন্যপন্থীরা মাধ্বী বলেই পরিচিত। এঁরা অনেক সময় যুগলমন্ত্রের উপাসক বলেও পরিচয় দিয়ে থাকেন। উপভাগ হিসেবে এঁরা নিত্যানন্দ শাখা, অদ্বৈতশাখা, গদাধরশাখা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। এঁদের মধ্যে ভেদাভেদ আছে। কিন্তু বৃহত্তর পরিচয়ের প্রশ্নে এঁদের অধিকাংশই গোস্বামী-মতের অনুগামী। তাই বাঙালী বৈষ্ণব সংস্কৃতি বলতে গোস্বামী মত ভিত্তিক সংস্কৃতিই বোঝায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে লেখাপড়ার প্রচলন খুব বেশী। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তত্ত্ববিচার দ্বারা গোস্বামী মত প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার পর ক্রমাগত তত্ত্বমূলক বিচার করে অন্যমতের ওপর গোস্বামীমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে হ'ত। কারণ অন্য মতাবলম্বীগণ, যথা, অদ্বৈতপন্থী ও সহজিয়া ও গৌরনাগরী মতাবলম্বীগণ এবং কর্তাভজা, কিশোরীভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় বিভিন্ন জায়গায় প্রবল ছিল। আবার গোস্বামীপন্থীদের মধ্যেও স্বকীয় ও পরকীয়া মতের বিরোধ ছিল। এই দুই দলের মধ্যে তত্ত্ববিচার চলত। তত্ত্ববিচার নানা পর্যায়ে হ'ত। ব্যক্তিগতভাবে, মঠ ও আখড়া ধরে। মহোৎসব ছিল তত্ত্ববিচারের সবচেয়ে বড় উপলক্ষ। কারণ মহোৎসবে নানা জায়গার গোস্বামী ও মহান্তগণ সমবেত হতেন। সভা করেও বিচার চলত। ১১৩৭ সালে অম্বরের রাজা সওয়াই জয়সিংহের উদ্যোগে স্বকীয়া পরকীয়া সংক্রান্ত একটি বিচারসভা ছয়মাস ধরে চলেছিল। এতে পরকীয়াবাদীরা জয়লাভ করে শিরোপা পেয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, তত্ত্ববিচারের ঐতিহ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রবল। বস্তুত তত্ত্ববিচার এঁদের ধর্মসাধনার অঙ্গ। রাগানুগাবাদীদের মতো নামে রুচি থাকলে আর স্মরণ, মনন ও কীর্তন করেই গোস্বামীপন্থীদের পরমার্থ লাভ হয় না। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দীক্ষাগুরুর সঙ্গে তত্ত্বগুরুর আশ্রয় নিতে হয়। তত্ত্বগুরু তত্ত্বশিক্ষা দেন। কিন্তু টোলের মতো পাঠক্রম ধরে বয়ঃপ্রাপ্ত গৃহস্থ শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। বৈরাগী শিষ্যকেও ওই ভাবে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। কারণ তার নিজের আখড়া আছে অথবা সে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে ঘুরে বেড়ায়। তাই তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর লাভ করে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা গুরুর কাছে প্রশ্ন করে পাঠাত। প্রশ্ন পাঠাতে হ'ত কাগজে লিখে। গুরু প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে শিষ্যের কাছে পাঠাতেন। খ্যাতনামা তত্ত্বগুরুদের কাছে এত জিজ্ঞাসুর সমাবেশ হ'ত যে তাঁরা লোক পাঠিয়ে প্রশ্ন সংগ্রহ করে এনে আবার লোক মারফৎ তার উত্তর পাঠাতেন। সাধারণ বৈষ্ণবদের মধ্যেও তত্ত্বালোচনার অভ্যাস প্রচলিত ছিল। লীলাকীর্তনে গোস্বামী মতের বিস্তার করা হয়। কীর্তনগানের মধ্যে গোস্বামীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাপদ গেয়ে তার অর্থ বোঝান হয়। আখ্যানভাগের সঙ্গে তত্ত্বব্যাখ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লীলাকীর্তনের প্রসঙ্গে শোনা তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা বৈষ্ণবদের মধ্যে

বহুল প্রচলিত প্রথা। আবার সভাস্থলে বা দশজনের সম্মুখে পরস্পরকে ফাঁকি বা জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাও রীতিসিদ্ধ ব্যাপার। অর্থাৎ তত্ত্বালোচনা ও তর্ক ভিন্ন বৈষ্ণবদের ধর্মচর্চা সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। এই জন্য তত্ত্বকথা যেখানে যা জানা যেত সে সব লিখে রাখতে হ'ত। সহজভাবে তত্ত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্যে গদ্য সূত্রাকার প্রশ্নোত্তর দিয়ে গ্রন্থও প্রণীত হয়েছিল। এই ধরনের গ্রন্থগুলি আশ্রয়তত্ত্ব, আশ্রয় নির্ণয়, সিদ্ধিপটল প্রভৃতি নামে পরিচিত। এইসব গ্রন্থে কীভাবে তত্ত্বগত প্রসঙ্গ প্রকাশ করা হ'ত তার একটু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "উজ্জ্বল : কোন উজ্জ্বল—রস উজ্জ্বল॥ কোন রস—প্রেমরস॥ কোন প্রেম—নবপ্রেম॥ কোন গণ—প্রহ্লার গণ॥ কোন প্রহ্লা—নবরস প্রহ্লা॥ স্বভাব কি—প্রকৃতি॥ কিশোরি জিউর কোন মুখ—মঞ্জুরী মুখ॥ কোন আখ্যান—মঞ্জুরী আখ্যান॥ কোন ভাব—গোপী ভাব॥ কোন সখি—প্রিয় সখি॥ কোন সম্প্রদায়—মধ্বাচার্য সম্প্রদায়॥ কি ভাব—পরকীয়া ভাব॥ তোমাতে কি সেবা॥ এখানকার ভাব চরণ কমলে, সেখানকার ভাব হৃদয়কমলে।

ভক্তি কয়ে : ভক্ত দুই॥ বৈরীভক্ত : রাগভক্ত এবং দুই॥ বৈধীভক্তের প্রাপ্তি কোথা : বৈকুণ্ঠ॥ রাগভক্তের প্রাপ্তি কোথা : শ্রীবৃন্দাবন। (সিদ্ধিপটল : নরোত্তম দাস)

উপযুক্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্যে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈধীভক্তিবাদীদের পরকীয়া মতাবলম্বী গোষ্ঠীর মূল উপপত্তিসমূহ সূত্রাকারে বিবৃত করা হয়েছে,

এইভাবে মূল উপপত্তিসমূহ জানবার পর ব্যাখ্যার প্রশ্ন ওঠে। তখন তত্ত্বগুরুর আশ্রয় নিতে হয় অথবা তর্কবিতর্ক করে জানতে হয়।

লেখাপড়া, বিশেষ করে জ্ঞানচর্চা ভিন্ন ধর্মচর্চা পূর্ণাঙ্গ হয় না বলে আখড়াধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল বেশী। আখড়াধারীদের মধ্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা পেত। আগেকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রালোচনা বৈষ্ণবীরা করতেন। গৃহস্থবাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার দরকার হলে বৈষ্ণবীদের নিযুক্ত করা হ'ত।

পাঠশালা ব্যবস্থা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির মিলিত প্রভাবে বাংলার গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। এই ধারা স্বয়ংক্রিয় স্বয়ংশাসিত গ্রামসমাজ দ্বারা পরিপোষিত হত। বাইরের কোন সহায়তা ব্যতিরেকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত ছিল।

নীচুজাতি কায়িকশ্রম, দারিদ্র এবং অশিক্ষা সমার্থক, আমরা এইরকম একটা ধারণার বশবর্তী। ইংরাজ আমলের প্রশ্নে ধারণাটা হয়ত সত্যি। কিন্তু এখন যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় ইংরাজ-পূর্ব ভারতে অবস্থাটা সম্ভবতঃ অন্যরূপ ছিল। ইংরাজ আমলে ভদ্রলোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে সে শিক্ষিত। সাধারণ লোকে লেখাপড়া জানত না বলে ভদ্রলোক বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এই যুক্তিতে ছোটলোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অশিক্ষা।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ভদ্রলোকদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। বস্তুতঃ তারা বাধাও দিয়েছেন। আমাদের সমাজে ঊনবিংশ শতকে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এই মনোভাব বলতে পারি একটা নতুন ব্যাপার। স্পষ্টতই সমাজে বড় রকমের ছেদ ঘটে গেছে। কীভাবে এই ছেদ ঘটল তার একটা দিকের অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের মনোভাবের কথা আমরা কিছু জানি। কিন্তু যারা অশিক্ষিত বলে বিবেচিত হ'ত তাদের মধ্যে পূর্বাগত ঐতিহ্য কেমন করে কতখানি লোপ পেল এবং তার ফলে তাদের চিন্তা ও জীবনযাপনে কী পরিবর্তন হ'ল সেটা আমরা এখনও জানি না। এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

যে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য আমাদের সমাজে ছিল, সাধারণ মানুষের চিত্ত বিকাশে তার কার্যকারিতা অস্বীকার করা যাবে না। গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্য দিক-গুলোও সেইজন্য আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন।[২২]

সংযোজন, টীকা ইত্যাদি □ পরমেশ আচার্য

হিতেশ সান্যাল আর আমাদের মধ্যে নেই। তার লেখা আছে। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক লেখা। গবেষক ঐতিহাসিক হিতেশ সান্যাল ছিলেন এক অমায়িক ব্যক্তিত্ব। বহু বিষয়ে ছিল তার অনুসন্ধিৎসা। ব্রিটিশপূর্ব ঐতিহ্যগত শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের একটি। কোন বিদ্বজ্জন-সভায় পাঠের জন্য লেখা এই প্রবন্ধটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। স্বচ্ছ চিন্তার এরকম সাবলীল প্রকাশ সত্যিই ঈর্ষণীয়।
প্রবন্ধটিতে হিতেশ কিছু উদ্ধৃতি এবং টীকা ও তথ্যসূত্রের অবকাশ রেখেছিলেন। আমার সাধ্যমত পাদপূরণের চেষ্টা করব।

১। হিতেশ সান্যাল টোলের প্রাথমিক স্তর হিসাবে আখড়ার কথা লিখেছেন। এ ধরনের আখড়ার অস্তিত্বের পক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আমি খুঁজে পাইনি। বাউল বৈষ্ণবদের আখড়া ছিল। তবে সেখানে পড়াশুনার চর্চা কতটা হত তার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এইসব আখড়ায় যে সংস্কৃত পড়ানো হত না সে বিষয়ে বুঝি সন্দেহ নেই। বৈষ্ণবীরা অনেকেই বাংলা জানতেন।* এরা যে বড় ঘরের মেয়েদের অনেক সময় কিছু লেখাপড়া শেখাতেন বা ধর্মীয় কাব্য পাঠ করে শোনাতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঊনিশ শতকের বড়বাড়ির ইতিহাসে। ঠাকুর বাড়িতেও এদের আনাগোনা ছিল।

* অ্যাডাম তার রিপোর্টেও লিখেছেন যে নাটোরে চৌদ্দ পনেরশ বৈষ্ণবী ছিল যারা মোটামুটি লিখতে পড়তে জানত এবং নিজেদের মেয়েদের লিখতে পড়তে শেখাত।
(Anathnath Basu edited Reports on the State of Education in Bengal by William Adam, Calcutta University, 1941, P. 189)

ব্রিটিশপূর্ব যুগে সংস্কৃত বাংলা হরফেও চর্চা হোত। তখনো 'নাগরী' সংস্কৃত চর্চার একমাত্র অক্ষর হয়ে ওঠেনি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাক্ষ্যে বলা যায় সংস্কৃত শিক্ষার্থীরাও বাংলা অক্ষর লেখার অভ্যাস করত। সম্ভবত বাড়িতে বা ব্রাহ্মণ গুরুমশায়দের পাঠশালায় অক্ষর ও কিছু ব্যাকরণ শিখে পড়ুয়ারা টোলে পড়তে যেত।

২। উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্টে লেখেন :

"A distinguised member of the General Committee of Public Instruction in a minute on the subject expressed the opinion, that if one rupee per mensem were expended on each existing village school in the Lower Provinces, the ammount would probably fall little short of 12 lakhs of rupees per annum. This supposes that there are 100,000 such schools in Bengal and Bihar and assuming the population of these two Provinces to be 40,000,000 there would be a village school for every 400 persons.... Taking, therefore, eleven-thirtieths of the above—mentioned 400 persons, and three—sevenths of the result, it will follow that in Bengal and Bihar there is on an average a village school for every sixty three children of the school going age."

সম্ভবত ১৮২৩ সালে এই minuteটি লেখা হয়। হিতেশ সান্যাল অ্যাডামের প্রথম রিপোর্টের ভিত্তিতেই একথা লিখেছেন। Anathnath Basu, ed, Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1836) by William Adam, Calcutta University, 1941 p. 6-7.

৩। আমার মনে হয়, হিতেশ সান্যাল অ্যাডামের যে দুটো কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন তা হচ্ছে :

(ক) "Their number (number of villages in Bengal and Bihar) has been officially estimated at 150,748 of which, not all, but most have each a school."

(খ) "...and it will still appear that the system of village schools is extensively prevalant; that the desire to give education to their male children must be deeply seated in the minds of parents even of the humblest classes...." Basu, ed, Adam's Report.

৪। ওয়ার্ড লেখেন :
"Almost all the larger villages in Bengal contain common schools."
W. Ward, A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos : Including a Minute Description of their Manner and Customs and Translation from their Principal works, Srerampore, 1818, vol. I, p. 160.

৫। ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের মতে :
"In Bengal, there had always existed a very large number of indigenous school."
"...every large Hindu village possessed a school of its own, and the foundation of a system of national education had, long previous to British rule been laid by the spontaneous efforts of Hindu and Muhammadan society."
উইলিয়াম অ্যাডাম, জেমস লঙ, হান্টার কমিশন এবং আরো অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ দেশজ শিক্ষাধারার এই গুরুত্ব বুঝতে পারলেও আমাদের ঊনিশ শতকের দেশীয় বিদ্বজ্জন এবং শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারকরা আদৌ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না।
W. W. Hunter, Report of the Education Commission, 1884, Calcutta, p. 36, 56.

৬। বুকানন লেখেন :
"There is no public provision for these useful members of society, and they depend entirely on their scholars for subsistence."
Martin, History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, vol. II, p. 705.

৭। অ্যাডাম তার তৃতীয় রিপোর্টে বীরভূমের পাঠশালার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :
"There are not fewer than eleven teachers who instruct their scholars gratuitiously, and of these there are not less than four in one thana..." "...in each of the Bengal districts a greater or less number of the teachers bestow their instruction gratuitiously, and even teachers who are paid instruct many scholars who pay nothing." p. 250.

অবশ্য এ ধরনের গুরুমশায় খুব বেশী ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে গরীব ছেলেদের বিনাবেতনে পড়ানো হত তাতে সন্দেহ নেই। এইসব পড়ুয়ারা কখনো সখনো গাছের শব্জী বা ফলমূল উপহার দিত। Basu : Adam's Report. p. 235.

৮। বুকানন তার দিনাজপুর রিপোর্টে লিখছেন :

"The first rudiments of education are usually given, both by Hindus and Muhammadans, in small schools called Pathsala, under the tution of teachers called Gurus, who may be of any caste or religion, who are poorly rewarded..." Martin, ibid, p. 705.

সতীশচন্দ্র মিত্র তার যশোর-খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন যে বুরুনির পরগণায় অনেক মুসলমান গুরুমশায় দক্ষ পাঠশালা শিক্ষক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

৯। অ্যাডাম তার মুর্শিদাবাদ রিপোর্টে লিখছেন :

"Parents of good caste do not hesitate to send their children of schools conducted by teachers of an inferior caste and even of a different religion. For instance the Musalman teacher above mentioned has Hindus of good caste among his scholars, and this is equally true of the chandal and other low-caste teachers enumerated."

এই উক্তির স্বপক্ষে আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। Basu, Adam's Report p. 228.

১০। পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, বিশ্বভারতী, ১৯৬৮, পৃ. ২২৮-২২৯, দ্রষ্টব্য।

১১। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে নাপিত বা কামার-কুমোরের জন্য জমি বন্দোবস্তের নজির থাকলেও পাঠশালা গুরুর জন্য জমি বন্দোবস্তের উদাহরণ খুব একটা দেখা যায় না। আসলে নাপিত বা কামার-কুমোরের সঙ্গে গ্রাম সমাজের যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল পাঠশালা গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক সেরকম ছিল না। বুকাননের মন্তব্য যে এদের জন্য কোন 'public provision' ছিল না, সেকথাই সাধারণভাবে ঠিক।

১২। পঞ্চানন মণ্ডল, পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮, পৃ. ১০।

১৩। পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ ১০১-১০৩।

১৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাক্ষ্যে এরকম ধারণা হয়ত করা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্তত বাংলা পাঠশালায় অমরকোষ অবলম্বনে সংস্কৃত ব্যাকরণ আর শব্দের ব্যুৎপত্তি শেখানো হত একথা বলার মত নিশ্চিত সাক্ষ্যের

অভাব আছে। কিছু ব্যাকরণ নিশ্চয়ই পড়ানো হত। অমরকোষের কোন বাংলা সংস্করণ প্রচলিত ছিল কিনা জানি না। সংস্কৃত সংস্করণ বোঝার মত সংস্কৃত বিদ্যা পাঠশালা গুরুমশায়দের যে ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য অ্যাডাম এক জায়গায় লিখেছেন এগুলি একসময় পড়ানো হত। এখন আর পড়ানো হয় না। হিতেশ অ্যাডাম সাহেবের কথাই মেনে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে আমি আমার 'বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা' নামক বইয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রবন্ধের অনেক বিষয় সম্পর্কেই ঐ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫। পঞ্চানন মণ্ডল, পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৬৪।

শিশুজ্ঞান চরিত্রের লিপিকাল ১২৬৯ বাংলা সাল বা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ। কাজেই এই বইয়ের সাক্ষ্যে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে ব্রিটিশপূর্ব যুগে নীতি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রচলিত ছিল। তবে বিভিন্ন পাঠে নীতি শিক্ষার বিষয় ছিল সন্দেহ নেই। তাছাড়া মুখে মুখে চাণক্যশ্লোক পড়ানো হত বলে মনে হয়।

১৬। লালবিহারী দে, Recollection of My School days, ed. Mahadev Prasad Saha, Edition Indian, Calcutta, 1969. p. 450-458.

১৭। "The Teachers depend entirely upon their scholars for subsistence, and being little respected and poorly rewarded, there is no encouragement for persons of character, talent or learning to engage in the occupation." Basu, ed. Adam's Report. p. 7.

অন্যত্র অ্যাডাম লিখছেন—

"The teachers, though qualified for what they undertake, are persons in no way respectable, their rank in life being low, their emolument scanty and sometimes their character publicly tainted without any injury to their interests."

কিছু সত্য থাকলেও এই কথা পুরো সত্য নয়। গ্রামের জমিদার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ব্রিটিশ যুগের ইংরেজি শিক্ষিতদের চোখে পাঠশালা গুরুমশায় নিতান্তই হেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামের চাষী এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর চোখে পাঠশালা গুরু সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আসলে ব্রিটিশপূর্ব যুগে বাংলা ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যে অবজ্ঞার ভাব ছিল সেই থেকে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পাঠশালা গুরুমশায়দের হেয় ভাবার প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতা গভীর হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার দৌলতে। ব্রিটিশপূর্ব যুগে গ্রাম সমাজে পাঠশালা গুরুর যে একটি মর্যাদার আসন ছিল তাতে সন্দেহ করার কারণ দেখি না।

ব্রিটিশ শাসক ও পাদ্রীদের চোখ দিয়ে পাঠশালা শিক্ষার বিচার করা সব সময় ঠিক নয়।

১৮। অ্যাডাম তার দ্বিতীয় রিপোর্টে লিখছেন :

"In the matter of instruction there are some grounds for

commendation for the course I have described has a direct practical tendency; and if it were taught in all its parts, is well adapted to qualify the scholars for engaging in the actual business of native society. My recollection of the village schools of Scotland do not enable me to pronounce that the instruction given in them has a more direct bearing upon the daily interests of life than that which I find given, or professed to be given, in the umbler village schools of Bengal."

Basu, Adam's Report, p. 146.

পাঠশালার পাঠ্য বাংলা পুঁথির দিকে তাকালে এই উক্তি কত সঠিক তা বোঝা যায়। পাঠশালা শিক্ষার বিস্তারের একটা বড় কারণ তার ব্যবহারিক কার্যকারিতা। ব্রিটিশ আমলের প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে পাঠশালা শিক্ষার একটা মূল পার্থক্য এখানেই।

১৯। টীকা ৯ দ্রষ্টব্য।

২০। অ্যাডাম লেখেন—

"With regard to the nature of these works, the employment of the Amara Kosha, the Ashta Sabdi, Ashta Dhatu, Subda-Subanta and the verses of Chanakya as school-books in some of the vernacular schools of the Bengal districts indicates a higher grade of instruction than I had previously believed to exist in those schools. With the exception of the verses of Chanakya, the other works mentioned are gramatical and their use is said to have been at one time general, which would imply that they are the remains of a former superior system of popular instruction preparatory, in the case of those who could follow it up, to the more enlarged course of learned study. The remaining works used in the common schools rank low as compositions, and consist, for the most part, of the praises and exploits of the Gods recognised by the established religion of the country."

Basu, Adam, p. 253.

হিতেশ সান্যাল অ্যাডামের এই উক্তির উপর বড় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়। এ বিষয়ে আমি আগে বলেছি। টীকা ১৪ দ্রষ্টব্য।

২১। আমি হিতেশ সান্যালের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত নই। গোস্বামী মতাবলম্বী

প্রচারকগণ গোস্বামী গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু 'তেলি, মালি, যুগী, কৈবর্ত, ডোম, বাগদী, কোটাল, পোদ জাতির লোক এইসব গ্রন্থ পাঠ করেছে' এবং 'সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে তত্ত্বচিন্তা ও তত্ত্বালোচনার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে' —এতবড় সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ নিশ্চয়ই প্রমাণ করে বাংলায় তত্ত্বচিন্তা এবং তত্ত্বালোচনার পরিবেশ তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু 'সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে' এই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ নেই। মনে রাখতে হবে এমন কি কিছু স্মৃতি গ্রন্থেরও বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। তাই বলে নীচুজাতের লোকেরা সেগুলি পাঠ করত এবং আলোচনা করত একথা বলা যায় না। সাধারণত সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ ব্রাহ্মণ সন্তানদের বংশগত পেশা বজায় রাখার তাগিদেই এগুলির কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছিল। তেমনি বৈষ্ণব সমাজের মাথাদের গোস্বামী মতের তাৎপর্য অনুধাবনে সাহায্য করার জন্যই এই বইগুলির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছিল। তাছাড়া সাধারণ্যে মুখে মুখে গোস্বামী মত প্রচারের জন্যও বাংলায় গোস্বামী মতের আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন গোস্বামীদের কৃপায় শেষ পর্যন্ত বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্য বাতাবরণে বরণ করার প্রথম ও প্রধান ভূমিকা নেয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তি শ্রীমদ্‌ভাগবত। এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের শঙ্কর ভাষ্যই তারা মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন। বাংলায় বেদান্ত ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কখনই সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে দাগ কাটতে পারেনি।

২২। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভেদে ভদ্রলোক ও ছোটলোক অবশ্যই ব্রিটিশ যুগের চিত্র। কিন্তু ব্রিটিশপূর্বে গ্রাম সমাজেও যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভেদাভেদ প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর এই ভেদাভেদ শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রকটছিল। ব্রাহ্মণদের জন্য ছিল সংস্কৃত শিক্ষা আর ব্রাহ্মণেতর সাধারণের জন্য ছিল বাংলা শিক্ষা। ব্রাহ্মণরা যে বাংলা ভাষার চর্চাকে অবজ্ঞা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই উক্তিতে—

কৃত্তিবেশে কাশীদেশে বামুন-ঘেঁষে।
এই তিন সর্বনেশে শাস্ত্র খেলে চুষে॥

আসলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদে ভদ্রলোক-ছোটলোক ভেদাভেদের বীজ খুঁজে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতেই। ব্রিটিশ যুগে চরিত্র কিছুটা পাল্টেছিল মাত্র। বহু-জাতিক (multi caste) শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠায় ভদ্রলোক কথাটি ভিন্ন অভিধা পায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন জাত (caste) গড়ে উঠায় সমস্যাটি এক নতুন মাত্রা পায়।

গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্য দিকগুলির আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাটির উপর নতুন আলোকপাতের যে প্রতিশ্রুতি হিতেশ সান্যাল দিয়েছিলেন তা পালন করার সময় তিনি পেলেন না। আমরাও আর একটি সুচিন্তিত-সুলিখিত প্রবন্ধ থেকে বঞ্চিত হলাম।□